সুন্দর বনের ব্যাঘ্র দেবদেবী

অশোক কুমার রায়

পশু বা পশুদেবতা পূজা আদিম যুগীয় ধর্মাচার এবং পশুভীতি অর্থাৎ পশুর গ্রাস হতে রক্ষা পাবে এই ঋাস আরণ্যক সমাজেইহা উদ্ভাবিত করেছিল। সে সময় লোকেরা দেবতাকে ভক্তবৎসল বা প্রেমময় বলে ধারণা করতে শেখেনি, তারা মনে করতো একটি অশরীরী আত্মা (যা পরে দেবতা বলে সমাজে কল্পিত হয়) যিনি সদাত্রুদ্ধ এবং প্রতিহিংসাপরায়ণ, তিনিই মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সকল দুর্ঘটনা বিপদ - আপদ শোক দুঃখ মৃত্যু এমন কি প্রাকৃতিক দুর্যোগগুলিও ঘটিয়ে থাকেন, হিংস্র পশুরা তাঁরই নির্দেশে মানুষকে হত্যা করে। আদিম সমাজের লোকেরা এইটাও উপলব্ধি করল যে, কায়িক শক্তি দ্বারা পশুর গ্রাস হতে রক্ষা পাওয়া যায় না, তারা অসহায় বোধ করল।

কালত্রমে আদিম মানব উপলব্ধি করল, পশু বা পশুকে যিনি পরিচালনা করেন তাঁকে আরাধনা বা বশীকরণ প্রত্রিয়া দ্বারা তুষ্ট করা প্রয়োজন। সেই কাজ তারা শু করল, এইভাবে, পশু বা পশুদেবতা পূজা প্রবতির্ত হয়েছিল। (অনুরূপ ভাবে এরপর এক একটি রোগ বা বিপদের অপহর্তা ঋাসে পৃথক পৃথক দেবতার পূজা পরিকল্পিত হল)।

এদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন প্রকারের পশুর প্রাধান্য দেখা যায়, যে অঞ্চলে যে পশু প্রধান, সে স্থানে সেই বিশেষ পশুর অধিষ্ঠাতা বলে একটি বিশেষ দেবতার পূজা পার্বণ অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। বাংলাদেশের দক্ষিণ প্রান্তিক ভূভাগ বা সুন্দরবন অঞ্চলের আরণ্যক সমাজে ব্যাঘ্রই ছিল সর্বাপেক্ষা ভয়ের কারণ; সেজন্য ঐ অঞ্চলে বা ব্যাঘ্রদেবতা পূজা শু হয়েছিল সেই আদিম যুগে। রক্ষণশীল ঋকবাদী পল্লীবাসীরা সে পূজাচার আজও ত্যাগ করেন নি। আদিতে এই ব্যাঘ্রদেবতার কি নাম, আকৃতি বা পূজাচার কিরূপ ছিল সেসবজানা যায় না, তবে অনুমান করা যায় দেবতাটির রূপ, নাম, পূজাচার এবং এর প্রতি অরণ্যবাসী ভক্তদের ধারণা বা ঋাস কয়েকবারপরিবর্তিত হয়েছে এবং পরবর্তীকালে সুন্দরবন সংলগ্ন বা নিকটবর্তী বসতি অঞ্চলে মাত্র কয়েক শতাব্দী পূর্বে ব্রাহ্মণ্য প্রভ াবে এই ব্যাঘ্রদেবতা সুন্দর আকৃতি ও শুদ্ধ বাংলা ভাষায় 'দক্ষিণ রায়' নাম লাভ করেছেন।

অনুমান করা যায় -- আদিতে কোন প্রতীকে বা ব্যাঘ্রমূর্তিতেই আরণ্যক সমাজে এ দেবতা পূজিত হতেন, পরবর্তীকালে দক্ষিণ প্রা ন্তিক অঞ্চলের কোন ভক্তিভাজন ব্যক্তির পূজাচারের সহিত ব্যাঘ্র বা ব্যাঘ্র দেবতা অর্চনার মিশ্রণ ঘটে। মানুষ দেবতা পরে প্রাধান্য প ান এবং আদি ব্যাঘ্রদেবতা গৌণ হয়ে যান ও মানুষ দেবতার বাহন রূপে অস্তিত্ব রক্ষা করেন। এই একীভূত দেবতার নাম হয় --- 'ব্য াঘ্রদেবতা দক্ষিণ রায়''। দক্ষিণ রায় বিষয়ে গবেষকদের দুএকজন এবং লেখক ধারণা করেন, ---দক্ষিণরায় সুন্দরবন অঞ্চলের একজন মানুষই ছিলেন, এবং তাঁর মাহাত্ম্য প্রচারার্থে রচিত মঙ্গল - কাব্যগুলিতে বর্ণিত (দক্ষিণ রায়ের) পূজা বা সৈন্যরা সত্যই বাঘ নয় -- তাঁরাছিলেন ব্যাঘ্র উপাসক শ্রেণীভুক্ত ব্যক্তি, যাঁরা নিজেদের ব্যাঘ্রসন্তান বলে মনে করতেন, তাঁদের কুলকেতু বা কৌলিক অভিজ্ঞান Totem ব্যাঘ্র ছিল এবং দক্ষিণরায় নামে পরিচিত প্রভুত্বশালী ব্যক্তিটি ঐ ব্যাঘ্র উপাসক কোমের গোষ্ঠীপতি বা নৃপতি ছিলেন।

প্রথম অধ্যায়ে এই ব্যাঘ্রদেবতা --- দক্ষিণ রায় সুন্দরবনের কোন গভীর অঞ্চলে সীমাবদ্ধ স্থানে পূজিত হতেন, ব্যাপক প্রসিদ্ধি লাভ করেন বহু পরবর্তীকালে। যে সময়, জীবিকা উপার্জনের জন্য বা অরণ্য সম্পদ সংগ্রহের কারণে দূরস্থ স্থান থেকে বাউলে (কাষ্ঠ সংগ্রহকারী), মোউলে (মম - মধু সংগ্রহকারী), মালন্দী (লবণ প্রস্তুতকারী), নৌজীবী (বিদেশগামী সওদাগর শ্রেণী), আবাদকারী কৃষকরা ঐ বিচ্ছিন্ন প্রায় দুর্গম ভয়াবহ বনরাজ্যে যাতায়াত শু করে। ঐ সকল ব্যক্তিদের মাধ্যমে দক্ষিণরায়ের পূজা - পার্বণ বাংল াদেশের বহুঅংশের পল্লীসমাজে প্রবর্তিত হয়। বিশেষ করে চব্বিশ পরগণা জেলায়।

পল্লীসমাজের অধিবাসীরা ধর্মীয় ব্যাপারে অতি রক্ষণশীল ও ঋক্থবাহী হওয়ায় বহিরাগত কোন ধর্মাচার তাঁদের উপর প্রভাব বিস্ত ার করতে সক্ষম হয় না, বর্তমানকালেও জানপাদ সমাজে বহু অশাস্ত্রীয় অপৌরাণিক দেবতার পূজাপার্বণ দেখা যায়। চব্বিশ পরগণ ার দক্ষিণ অংশে পৌষ সংত্রান্তি বা তার ঠিক পরের দিন পয়লা মাঘে, প্রায় সর্বজনীন ভাবে দক্ষিণ রায়ের 'বারা' প্রতীক (মুখমণ্ডল চিত্রিত ঘট) পূজিত হয়। দক্ষিণরায়ের প্রতিমূর্তি বিরল এবং উন্নত পল্লীতেই শুধু দেখা যায়।

সুন্দরবনের প্রায় প্রত্যেক প্রবেশ পথের ধারে, খাল বিল নদনদীর তীরে, দক্ষিণরায়ের যুগ্ম 'বারা'র পূজা হয়। স্থানীয় অধিবাসীদের ঋাস ঐ বারা দুটির একটি দক্ষিণ রায়ের অপরটি তাঁর ভ্রাতা বা অন্য বনদেবতা কালু রায়ের (মতান্তরে দক্ষিণরায়ের মাতা নার

য়নীর) প্রতীক। উন্নত পল্লীতে বা বনাঞ্চল কোথাও দক্ষিণ রায় কুলদেবতা হিসাবে বা গৃহে পূজিত হন না, সর্বত্র এর পূজা স্থান হল বৃক্ষতল। উন্নত অঞ্চলের কোনও কোনও ক্ষেত্রে বর্ণ ব্রাহ্মণ এই লৌকিক দেবতাটির পূজায় পৌরোহিত্য করেন, তাঁরা প্রচার করেন, ---দক্ষিণ রায় শিবপুত্র বা আরোগ্য দেবতা। এ সকল স্থানেও দক্ষিণরায় বৃক্ষতলে নির্মিত চালা ঘর বা 'থানে'ই থাকেন। আরোগ্য দেবতা বা শিবপুত্র বলে এবং শাস্ত্রীয় বিধানে পূজিত হলেও দক্ষিণরায়কে বহুস্থানে ব্যাঘ্র পৃষ্ঠে দেখা যায়; বা তাঁর মূর্তির পাশে ব্যাঘ্রমূর্তিও থাকে। দক্ষিণরায়ের পূর্ণমূর্তি হিন্দু রাজাদের কালের রাজা বা রাজসেনাপতির অনুরূপ। শাস্ত্রজ্ঞ পুরোহিতরাও দক্ষিণ রায় পূজার ব্যাপারে লোকায়ত বিধান বহুলাংশে পালন করেন।

দক্ষিণরায় পূজার আদি রূপ দেখা যায় এঁর 'জাঁতাল' পূজায়। এই জাঁতাল পূজা এখনও সুন্দরবনের গভীর অঞ্চলের অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। ঐ স্থানের কোন নদীর ধারে বিঘা দুই সমতল ক্ষেত্রের কেন্দ্রস্থানে একটি বেদী তৈরী হয়, তার উপর অতি ভয়াবহ আকৃতির দুটি মুণ্ডমূর্তি স্থাপিত হয়। ঐ দুটির একটি দক্ষিণ রায়ের অপরটি তাঁর মাতা নারায়ণী দেবীর (মতান্তরে কালু রায়ের) প্রতীক। এ পূজা আরম্ভ হয় গভীর রাত্রে। দেবতার বেদীটি খেজুর গাছের শাখা দিয়ে বেষ্টিত থাকে। পূজাক্ষেত্রে কয়েকটি বড় বড় মশাল জ্বালানো হয়, পৌরোহিত্য করেন গ্রাম - মোড়ল (ব্রাহ্মণেতর জাতি) জয়ঢাক, কাঁসি প্রভৃতির বাদ্য, মোষ ও পশুপক্ষী বলি এবং নৈবেদ্যে মদ্য, কাঁচা মাংস, গাঁজা, ভাঙ দেওয়া আবশ্যিক বা লোকায়ত প্রথা বলির সময় বাদ্যের উৎকট শব্দে ও ভক্তদের উল্লাস ধ্বনিতে ঐ অঞ্চল কেঁপে ওঠে। বলির পশুপক্ষীদের রক্তে পূজাক্ষেত্র কর্দমাক্ত হয়ে যায় -- ভক্তরা মশাল হাতে সেই স্থানে নৃত্যও করে থাকেন।

দক্ষিণরায় পূজার আধিক্য থাকায় এবং তাঁর বিষয় বাংলাদেশের বহু মনীষী বা গবেষকদের দীর্ঘকালব্যাপী আলাপ আলোচনা প্রবন্ধ প্রকাশের জন্য তিনি শিক্ষিত সমাজে বিশেষভাবে পরিচিত হয়েছেন। কিন্তু দক্ষিণরায় একমাত্র ব্যাঘ্রদেবতা নন, সুন্দরবন অঞ্চলে ও তার নিকটস্থ পল্লীগুলির অধিবাসীরা এবং ঐ অরণ্যে যাতায়াতকারীরা অপর ব্যাঘ্রদেবতাদের ও পূজা করে থাকেন। সেগুলির মধ্যে দক্ষিণরায়ের ভ্রাতা কালুরায় এবং তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী বলে কথিত বড়খাঁ গাজী এবং বনবিবির খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা বহু প্রাচীন।

তিন চারশো বছর আগে স্থানীয় পল্লীকবিদের রচিত মঙ্গলকাব্য, এবং জনশ্রুতি থেকে জানা যায়, দক্ষিণরায়, বড়খা গাজী, কালুরায় ও বনবিবি এই চারটি ব্যাঘ্রদেবতা এককালে সমভাবেই প্রসিদ্ধ ছিলেন, সেজন্য তাঁদের প্রত্যেকেরই মাহাত্ম্য প্রচারের জন্য কাব্য প্রভৃতি রচিত হয়েছিল।

দক্ষিণরায়ের মাহাত্ম্য প্রচারের উদ্দেশ্যে মধ্যযুগ এবং তার কিছু পরবর্তীকালে রচিত কয়েকটি 'রায় মঙ্গল' (বা দক্ষিণ রায় মঙ্গল) কাব্যের সন্ধান পাওয়া যায়। ঐগুলির মধ্যে কবি কৃষ্ণরাম দাসের এবং দ্বিজ হরিদেব রচিত 'রায়মঙ্গল' সম্পূর্ণভাবে সংগৃহীত এবং মুদ্রিতও হয়েছে। কবি কৃষ্ণরাম দাসের 'রায়মঙ্গল'টির বিষয় এ প্রবন্ধে আলোচনা করছি ও তার স্থানবিশেষ উদ্ধৃত করছি। ঐ রায়মঙ্গলের বিশেষ অংশটি দক্ষিণ রায় য তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী অপর ব্যাঘ্রদেবতা বড়খা গাজীর যুদ্ধ বিষয়ে লেখা। সমগ্র কাব্যের মধ্যে ঐ অংশটি বহু মূল্যবান।

কবি কৃষ্ণরাম নিজে চবিবশ পরগণার লোক ও দক্ষিণরায়ের একান্ত ভক্ত ছিলেন; তিনি তাঁর রায়মঙ্গল কাব্য রচনার হেতু সম্বন্ধে বলেছেন---

"রজনীর শেষে এই দেখিলাম স্বপন।
বাঘপৃষ্ঠে আরোহণ এক মহাজন।।
করে ধনুঃশর চা সেই মহাকায়।
পরিচয় দিলা মোরে দক্ষিণের রায়।।
পাচালি প্রবন্ধে কর মঙ্গল আমার।
'আঠার ভাটীর' মধ্যে হইবে প্রচার।।"

('আঠার ডাটী - সুন্দরবন)। কবি কৃষ্ণরামের দক্ষিণ রায় বন্দনাতে আছে---

"সোনার বরণ তনু আগ্নী নাগর তনু;
নিসাদনি অশনি বিজয়।
বিশাল লোচন জোড় শ্রবণ অবাধ ওর,
চাহবনি চমমে রিপুচয়।।
নল নাল মধু আর সব তুয়া অধিকার,
মউলা মালন্দী করে সেবা।
পূজা করে একমনে কাষ্ঠ কাটে গিয়া বনে,
বাহুল্যা বহুল্যা কত ঠাঞী।

পাইলে নাহিক খায় বাঘেরা বিমুখ হয়,
তোমার কৃপায় ভয় নাঞি।”

রায়মঙ্গলের একটি সংক্ষিপ্ত কাহিনী

সারা আঠার ভাটী অর্থাৎ সুন্দরবন দক্ষিণরায়ের রাজত্ব, তিনি নিজে বা তাঁর রাণী বাঘ না হলেও ঐ বনদেশের প্রজা ও সৈন্যরাসব াই বাঘ। দক্ষিণ রায় তাঁর রাজধানী ‘খাড়ী’ নামক শহরে সপরিবারে এবং পাত্র মিত্র, সেনাপতি প্রভৃতি সহ থাকেন। দুর্ধর্ষ হলেও বাঘ প্রজারা তাঁর বিশেষ অনুগত এবং আঞ্চলিক অরণ্য সম্পদও প্রচুর। দক্ষিণ রায়ের রাজ্য শান্তিপূর্ণ।

ঠিক বিধাতা পুষের নির্দেশ কিনা জানা যায় না, তবে সুন্দরবনে দক্ষিণরায়ের এবং হিজলী (মেদিনীপুর জেলার) অঞ্চলে কালুরায়ের প্রাধান্য আজও লক্ষ্য করা যায়। শুধু তাই নয়, উত্ত দুস্থানে পীরসাহেব বা বড়খাঁ গাজীর দরগা বা সমাধি প্রতীকগুলি হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের ব্যত্তি সম্মানের চক্ষে দেখেন, গাজীর উদ্দেশ্যে পূজা হাজোত দিয়ে থাকেন।

কালুরায়ও একটি ব্যাঘ্রদেবতা, চবিবশ পরগণা জেলার দক্ষিণ অংশে সুন্দরবন অঞ্চলে ইনি দক্ষিণরায়ের ভ্রাতা বা সহদেবতা র ূপেই পূজিত হন, এর পৃথক অস্তিত্ব নেই বললেই হয়, তবে কোন কোন স্থানে এঁকে কুম্ভীর কুলের অধিদেবতা বলে পূজিত হতে দেখ াগেলেও এ জেলায় বোধ হয় এর প্রাধান্য কম।

মেদিনীপুরে কালুরায়ের (মতান্তরে কালু গাজীর) পূজার্চনা অধিক অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। একক ভাবেই পূজিত হন। তবে পূর্বে যে সুনুদরবনের সমগ্র অঞ্চলে এর প্রভাব প্রতিপত্তি এককালে ছিল, তা জানা যায়, বহুদিন পূর্বে রচিত কালু রায়ের মাহাত্ম্য প্রচারার্থে রচিত কয়েকটি মঙ্গলকাব্য হতে। প্রসিদ্ধি না থাকলে কোন দেবতার মাহাত্ম্য প্রচারের জন্য কেউ কাব্য রচনা করে না। কবি শ্রীবল্লভ ও দ্বিজ নিত্যানন্দের রচিত কালুরায় মঙ্গল পাওয়া গেছে, শেষোত্ত কাব্যের অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করছি। ঐ মঙ্গলকাব্যে কালুরায়ের বন্দনা বা রূপ বর্ণনাতে আছে

“শিরে শোভে পাগ বান্ধা
তাহে গুঞ্জাফল বান্দা,
ভালে ফোঁটা শোভে শশধর।
গলেতে দ্রাক্ষ মালা
অটবি করে উজলা,
কটি তটে শোভে পাটম্বর।।
ভবানীর আজ্ঞা পেয়ে
আশাবাড়ি হাতে নিয়ে
রক্ষা কর শার্দুলের পাল।
তোমার যে নিন্দা করে
অকালেতে কক্ষে ধরে,
মরনের তার নাহি কালাকাল।।”

বনবিবির উল্লেখ পূর্বে করেছি, ইনিও ব্যাঘ্র - কুলের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বিশ্বাসে সুন্দরবনের ও উহার নিকটবর্তী বসতি অঞ্চলে পূজিত হন। মর্যাদা বা প্রসিদ্ধির দিক থেকে দক্ষিণরায়ের পরেই এঁর স্থান। বনবিবি পালা গান বা যাত্রা এখনও পল্লী অঞ্চলে প্রচলিত অ াছে।বনাঞ্চলে বা কিছুকাল পূর্বে যে সকল পল্লী অরণ্যাবৃত ছিল - সেরূপ স্থানে, বনবিবির বহু থান দেখা যায়। ঘট প্রতীক বেশি ক্ষেত্রে পূজিত হলেও পূর্ণ মূর্তি বিরল নয়। মুসলমান প্রধান অঞ্চলে এই দেবীর আকৃতি বা বেশভূষা অলংকার ইত্যাদি ধনী মুসলম ান পরিবারের কিশোরী বালিকার অনুরূপ বাইন মোরগ, অন্যত্র এঁকে হিন্দু শাস্ত্রীয় দেবীর মত দেখায়, ব্যাঘ্র বাহনা হলেও কোলে শিশু থাকে। সুন্দরবনে প্রবেশকালে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের ব্যত্তি এঁর পূজা করে থাকেন। বনবিবির থানের ফকীরদেরও অ ারণ্যক সমাজে বিশেষ সম্মান আছে। স্থানীয় বহুলোকের ধারণা ঐ ফকীররা মন্ত্রতন্ত্র বলে বনের বাঘকে জব্দ করতে পারেন। ফকীরদের মধ্যে অনেক ‘বাঘের ওঝা’, ‘বাউলে গুণীন্’ বলেও পরিচিত। সুন্দরবনের গভীর অঞ্চল গামী বহু ব্যত্তি এই দেবীর উদ্দেশ্যে বনের মধ্যে মুরগী ছেড়ে দেন। চবিবশ পরগণার দক্ষিণ প্রান্তিক অঞ্চলে বনবিবির প্রসিদ্ধি বহু শতাব্দী হতে আছে। বিশেষ খ্যাতি থাক ায় মুসলমান কবিরা তাঁর মহাত্ম্য কাব্য বা কেচ্ছা রচনা করেছেন। ঐগুলির মধ্যে মুন্সী বয়নদ্দী রচিত ‘রোনবিবির জহুরা নামা’ ক াব্যটি লোকসংস্কৃতি বিষয়ে গবেষক মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে ও বেশ পুরাতন। উদ্দেশ্যমুলক রচনা হলেও এই কাব্যটিকে ‘র ায়মঙ্গল’ কাব্যের পরিশিষ্ট অংশ বলে মনে করা যায়, এ কাব্যে দক্ষিণরায়, বড়খাঁ গাজীরাও কথা আছে।

জহুরানামার কাহিনী

রসুলের আদেশে বনবিবি মক্কা থেকে সুন্দরবনে এসে বাদাজমি দখল করতে উদ্যোগী হলেন, কিন্তু সে সময় ঐ অঞ্চলও দক্ষিণর

য়ের অধিকার। বনবিবি সে কারণে ভীত হলেন না, সঙ্গে তাঁর ভাই মহাশক্তিশালী - শা জাঙ্গুল ও অনুচর রূপে বহু সুযোদ্ধা ফকীরও ছিলেন। বনবিবি বাদাজমি দখল করতে দক্ষিণরায় ত্রুদ্ধ হয়ে তাঁর বিদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করতে উদ্যোগী হলেন। কিন্তু রাজমাতা দেবী নারায়ণী, তাঁকে বাধা দিয়ে বললেন, 'নারীর সঙ্গে পুষের যুদ্ধ করা বিধেয় নয়, আমি বনবিবির সঙ্গে যুদ্ধ করবো'---

"তুমি থাকো আমি যাই,
হারিজিতি লাজ নাই,
আওরাতে আওরাতে লড়াই ভাল।"

নারায়নী বীর যোদ্ধার বেশে যুদ্ধক্ষেত্রে পৌঁছে--

"খঞ্জর লইয়া হাতে নেমে আইসে
রথ হাতে।
মারে জোরে বিবির উপর,
না লাগে বিবির গায়
ফুল হয়ে উড়ে যায়,
ফতেমার দোয়ার গুণেতে।।"

বনবিবিও বীরনারী, তিনি নারায়ণীকে আত্রমণ করলেন--

'বনবিবি হুঙ্কারিয়া চারদিক
বেড়া দিয়া,
ঘেরে সবে প্রজামের জালে।
খুন্তি আসা ছিল হাতে
ফুক দিয়া ছাড়ে তাতে,
ছেড়ে দিল আশমানের পানে।"

নারায়ণীর আর রক্ষা নেই, তিনি প্রাণ ভয়ে বনবিবিকে জড়িয়ে ধরে, 'সই' বলে সম্বোধন করলেন, শুধু তাই নয়, তিনি প্রতিশ্রুতি দিলেন সুন্দরবনের বনের মধ্যে মাত্র কেঁদখালি নামক অঞ্চলে তিনি থাকবেন, দক্ষিণরায়ের সমগ্র রাজ্য তিনি অধিকার করবেন না। তবে সুন্দরবনের সকলে যে তাঁকে জীব জগতের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বলে সম্মান করে।

দক্ষিণরায়ের যে বিষয়ে কোন আপত্তি নেই। তিনি নিশ্চিন্তে বনরাজ্য শাসন করতে লাগলেন। কিন্তু কিছুকাল পরে একটা ব্যাপার ঘটলো -- 'দুঃখে' নামে এত অতি গরীব বালক, পেটের দায়ে তার জ্ঞাতি চাচার সঙ্গে সুন্দরবনে কাঠ সংগ্রহের জন্য এল। কিন্তু তার চাচা বনের মধ্যে উপযুক্ত কাঠ না পাওয়ায় দুঃখেকে সেই বনরাজ্যে ছেড়ে দিয়ে চলে গেল।

দুঃখে একাকী অসহায়ভাবে একটা গাছের তলায় বসে আছে, অকস্মাৎ সে দেখলে, একটা বিকট আকৃতির বাঘ তাকে আত্রমণ করতে আসছে। সে প্রাণভয়ে ভীষণ আর্তস্বরে 'মা' 'মা' বলে কেঁদে উঠলো।

বনবিবি তাঁর আস্তানা আলো করে বসে ছিলেন।

"বিবির রূপের কথা না যায় কথন।
রূপে তার কেঁদখালি হয়েছে রৌশন।।
দুঁখের কন্দনে হেলে বিবির আসন।
অন্তরে ধিয়ানে বিবি জানিল তখন।"

বনবিবি আর স্থির থাকতে পারলেন না, তিনি তাঁর বীর ভ্রাতাকে সঙ্গে নিয়ে বনের মধ্যে গিয়ে দেখলেন -- একটি বালক গাছতলায় বসে কাঁদছে আর একটি বাঘ তাকে আত্রমণ করতে আসছে। বনবিবি বাঘের প্রতি আর না দেখে নিমেষের মধ্যে বালকটিকে কোলে তুলে নিলেন। বনবিবির ভ্রাতা শা জাঙ্গুলী বাঘটাকে আত্রমণ করতে গেল, বিবি এই বাঘটাকে লক্ষ্য করতেই বুঝলেন ঐ ব্যাঘ্ররূপী দক্ষিণরায়। তিনি দক্ষিণরায়ের উপর ভীষণ ত্রুদ্ধ হলেন। দক্ষিণরায় একা এবং নিরস্ত্র, তিনি প্রাণ রক্ষার জন্য বড়খাঁ গাঁজীর দরগায় গিয়ে তাঁর শরণাপন্ন হলেন (গাজী এখন তাঁর দোস্ত)। বনবিবি দক্ষিণরায়ের মধ্যে বিবাদ মিটে গেল। বনবিবি শান্ত হয়ে দক্ষিণরায়কে বললেন,

"আন্টার ভাটির মাঝে আমি সবার মা,
মা বলি ডাকিলে কা বিপদ থাকে না;
বিপদে পড়ি যেবা মা বলি ডাকিবে।
কবু তারে হিংসা না করিবে।।"

দক্ষিণরায় প্রতিশ্রুতি দিলেন, বনবিবির সঙ্গে দক্ষিণরায়ের বিবাদ মিটে গেল, গাজীর সঙ্গে ত আগেই বন্ধুত্ব হয়েছিল।
এখনও সুন্দরবন অঞ্চলে বহু ক্ষেত্রে দেখা যায়, একই চালা ঘরে বা থানে --- দক্ষিণরায়, বড়খাঁ গাজী এবং বননবিবির মূর্তি পাশাপাশি বিরাজ করছে।